গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ১১ জুন, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

৪ জুন কলকাতার ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে সি ই এস সি ক্যাশ কাউন্টারের সামনে কমিশনের আদেশনামা পুড়িয়ে প্রতিবাদ

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে সরকারি অসহায়তার কথা শঠতায় পূর্ণ

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে বিদ্যুৎমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে অসহায়তা প্রকাশ করে যে বিবৃতি দেন, অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস তার নিন্দা করে ২৯ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

''বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুলবৃদ্ধি সম্পর্কে বিদ্যুৎমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন তা ধূর্ততা এবং মিথ্যায় পরিপূর্ণ। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন রাজ্য সরকারের মনোনীত সংস্থা। রাজ্য সরকারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে কমিশনের রায়ের প্রতি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদেও একইভাবে মাশুল বৃদ্ধি ঘটতে চলেছে। জনসাধারণ যাতে কোন প্রতিবাদ না করে এই মূল্যবৃদ্ধিকে মেনে নেয়, তার জন্য পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে।

সকলেরই মনে আছে যে, রাজ্য সরকার নিজেই ধাপে ধাপে অভিন্ন মাশুলের নামে গরিব-মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে দাম কমাবার জন্য বিল পাশ করিয়েছিল।

রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে এখনও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের এই জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে।

প্রকৃত ঘটনা হল, বিগত এন ডি এ সরকার, বর্তমান ইউ পি এ সরকার এবং বামফ্রন্ট সরকার পরিকল্পিতভাবে গরিব মানুষের টাকা কেড়ে নিয়ে বৃহৎ শিল্পের ও বহুজাতিক সংস্থার ঘরে তুলে দেবার জন্যই এই জনস্বার্থবিরোধী মাশুলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে।''

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে প্রধান অপরাধী কারা ?

এন ডি এ জোট সরকারকে হঠিয়ে সিপিএমের সমর্থনে কংগ্রেস ও অন্য কয়েকটি দল যে 'সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা' (United Progressive Alliance) বা ইউপিএ সরকার গঠন করেছে তার মন্ত্রীসভায় আসীন হয়েছে এমন কয়েকজন ব্যক্তি যাদের নামে খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ সহ বহু মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলে অভিহিত ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের কুশীলবদের প্রকৃত চেহারাটা এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সুযোগ বুঝে মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। 'মন্ত্রীসভায় দাগী অপরাধীদের স্থান দেওয়া চলবে না' — এই দাবিতে বিরোধিতার আসর গরম করতে বিজেপি নেতারা রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। যদিও এ ব্যাপারে তাঁদের দলের রেকর্ডও কিছু নিষ্কলুষ নয়। বিজেপি পরিচালিত বিদায়ী এন ডি এ সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী স্বয়ং বাবরি-মসজিদ ধ্বংস মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। ঐ একই মামলার আসামী উমা ভারতীরও এন ডি এ সরকারের মন্ত্রী হতে আটকায়নি।

বিগত লোকসভায় অন্যান্যদের সঙ্গে খুনের মামলায় অভিযুক্ত বিহারের কুখ্যাত অপরাধী পাপ্পু যাদব বাহুবলে জিতে এসে বিগত লোকসভার সংসদ কক্ষ আলোকিত করেছিল। একই ধারাবাহিকতায় এবারের লোকসভা নির্বাচনেও বেশ কিছু অপরাধীদের রমরমা। যে কংগ্রেস দলের পরিচালনায় এবারের সরকার গঠিত হয়েছে, সেই কংগ্রেসই গুজরাট রাজ্যে তিন কুখ্যাত অপরাধী — যাশুভাই বারাড, রাজেন্দ্র সিং প্যাটেল এবং বিট্টলভাই রাঢাড়িয়াকে তাদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল। এদের মধ্যে প্রথম জন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুনের চেষ্টা এবং হুমকির অভিযোগে অভিযুক্ত। দ্বিতীয়জনের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্র

চারের পাতায় দেখুন

চাষীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

সূর্যমুখীর চাষের বিপর্যয় সম্পর্কে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

''সরকারের দেওয়া বীজ চাষ করে যেমন গম চাষীরা কয়েকটি জেলায় সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তেমনি সূর্যমুখীর বীজ চাষ করেও চাষীরা বিপর্যস্ত হয়েছে। দেনায় জর্জরিত চাষীরা অতি দুঃখে ফসলের ক্ষেতে আগুন জ্বালাতে বাধ্য হয়েছে। এটা পরিষ্কার, কোন বিশেষ কোম্পানি থেকে পরীক্ষা না করে এই ধরনের বীজ যে চাষীদের দেওয়া হচ্ছে, এতে সরকারের বিশেষ দুর্নীতিচক্র কাজ করছে। আমরা দাবি করছি ঃ (১) ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (২) এই ধরনের বীজ সরবরাহ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, (৩) যেকোন বীজ সরবরাহ করার আগে, পরীক্ষা করে তার গুণাগুণ যাচাই করে নিতে হবে।''

মুরলীমনোহর যোশির অমৃতবাণী

কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি জোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মুরলীমনোহর যোশি, যাঁর হাত দিয়েই শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের কার্যক্রমটি রূপায়িত হচ্ছিল, তিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু অভিযোগ তাঁকে তাড়া করছেই। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে গত ২৫ মে এলাহাবাদে এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণে (সংবাদ প্রতিদিন ২৬-৫-০৪) তিনি বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিযোগ সত্য নয়, আসলে ''এন ডি এ সরকারের আমলে শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক করতে মানবিক মূল্যবোধ, পরিবেশ রক্ষা, দেশের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্য, ··· সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা জুড়ে দেওয়া হচ্ছিল। ··· এন সি ই আর টি-র বইতে কিছু সঠিক তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ··· যাতে ছাত্ররা 'ভারতের সঠিক ইতিহাস' জানতে পারে'', ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদেশে শিক্ষার পাঠক্রমে কী কী বাদ দেওয়া উচিত তা নিয়ে যেসব প্রশ্নের মীমাংসা আজ থেকে ১৫০-২০০ বছর আগে হয়ে গিয়েছিল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যার অভ্রান্ততা প্রমাণিত, আজ সেইসব পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া পাঠ্যবিষয় শিক্ষায় ঢোকাতে চেয়ে যোশিজীরা হয়ে গেলেন আধুনিক? যেমন ডঃ যোশি ও সংঘ পরিবারের নেতারা সনাতন ভারতীয় শিক্ষাদানের নাম করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বেদ-বেদান্ত পড়ানো ও তার জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সংস্কৃত পড়ানো আবশ্যিক করতে চেয়েছেন। অথচ, এদেশে আধুনিক শিক্ষার আলো এসেছিল যাঁদের হাত ধরে, তাঁদের অগ্রগণ্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

রামসফেল্ডের সফরের প্রতিবাদে ঢাকায় বাসদ-এর বিক্ষোভ

৫ জুন বিকালে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনসমাবেশে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) নেতৃবৃন্দ বলেন — ইরাকে তীব্র প্রতিরোধের মুখে বুশ-ব্লেয়ার চক্র গরিব দেশগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহের অভিযানে নেমেছে। এরই অংশ হিসেবে রামসফেল্ড বাংলাদেশে এসেছে। বিএনপি-জামাত জোট সরকার যদি এতে সাড়া দেয় তাহলে গণবিস্ফোরণে তার আসল টলে উঠবে। বাংলাদেশ থেকে কাউকে ইরাকে যেতে হলে রাজাকার হতে নয়, ইরাকিদের পাশে দাঁড়িয়ে দখলদারবিরোধী যুদ্ধ করতেই সে যাবে।

বাংলাদেশে রামসফেল্ডের সফরের প্রতিবাদে এবং ৫ জুন ওয়াশিংটনে যুদ্ধবিরোধী সংগঠন ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism)-এর উদ্যোগে লাখো মানুষের রামসফেল্ডের বাড়ি ঘেরাও মিছিলের প্রতি সংহতি জানিয়ে এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আবদুল্লাহ সরকার, বাসদ ঢাকা মহানগর সমন্বয়ক

সাতের পাতায় দেখুন

জলের দাবিতে এবং বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে

রাঁচিতে আন্দোলন

গোটা ঝাড়খণ্ড জুড়ে জলের জন্য হাহাকার চলছে। রাঁচি সহ কয়েকটি জেলায় অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। গত বছরই এই বিষয়টি নিয়ে এস ইউ সি আই এবং এ আই এম এস এস-এর উদ্যোগে রাঁচির জেলা শাসকের কাছে শত শত মহিলা-পুরুষ গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। এরপর কিছু কিছু এলাকায় কিছু কিছু কাজ হয়। কিন্তু এবারও জলের জন্য হাহাকার চরমে পৌঁছুলে রাঁচি জেলা পার্টি ইউনিটের পক্ষ থেকে গত ২৬ মে, শিখা বিশ্বাস, দশরথ বড়াইক।

পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা সহ ৮ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অশোক সিং, মোহন সিং, অঞ্জু কুমারী, রেণুকা ত্রিবেদী, শান্তি দেবী, শোভা সুমন, স্বপ্না সাহু, নির্মলা রাম, শিবানী টোপ্পো, আফতাব আলম।

জেলা শাসক স্মারকলিপির প্রতিটি দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে বলেন যে, শীঘ্রই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে ঝাড়খণ্ডে বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মিছিলকারীরা এলবার্ট এক্কা চৌকে গিয়ে ঝাড়খণ্ড সরকারের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, ঝাড়খণ্ডে বিদ্যুতের দাম এমন করে বাড়ানো হয়েছে যাতে গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ছোট দোকানদার ও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অন্যদিকে বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের জন্য বিদ্যুতের দাম কমানো হয়েছে। তিনি এই অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

কয়েকশো পার্টি কর্মী ও সমর্থক মিছিল করে জেলা শাসকের অফিসে গিয়ে অফিসের প্রধান গেট বন্ধ করে দেয়। মিছিল জেলা স্কুল থেকে বেরিয়ে ফিরায়ালাল চৌক হয়ে কচহরি চৌকে অবস্থিত জেলা শাসক অফিসে যায়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমরেডস অশোক সিং, কেয়া দে, রাজেশ রঞ্জন, মিণ্টু পাসওয়ান, প্রকাশ মিশ্র, জানো মাহাতো, জলি দাশ, উর্মিলা তিওয়ারী,

বোকারো

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২ জুন বোকারোতে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারাণ্ডির কুশপুতুল দাহ করা হয়। কমরেড রঙ্গিলা বৈঠার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস মোহন চৌধুরী, পি কে দুবে, মনোজ সিং এবং ছাত্রসংগঠক মদন চ্যাটার্জী। ব্যাপক অংশের সাধারণ মানুষ এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগকে স্বাগত জানান, বহু মানুষ সভাতেও যোগ দেন।

জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে

পরিচারিকা সমিতি ও শ্রমজীবী মহিলা রেলযাত্রী সংগঠনের স্মারকলিপি পেশ

জাতীয় মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে গত ৩ জুন শিয়ালদহ স্টেশনের নতুন বাড়িতে মহিলা-যাত্রীদের সমস্যার বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য একটি ফোরামের আয়োজন করা হয়েছিল। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষে পার্বতী পাল ও শ্রমজীবী মহিলা রেলযাত্রী সংগঠনের পক্ষে ছবি মণ্ডল এদিন মহিলা কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়িতে যাঁরা পরিচারিকার কাজ করেন, হাটে-বাজারে সামান্য ফুল-বেলপাতা বিক্রি করেন, রাজমিস্ত্রির বা রং মিস্ত্রির যোগাড়ে হয়ে খাটেন, তাঁদের আয়ের যা পরিমাণ তাতে মাসিক টিকিটের টাকা ব্যয় করে নিত্য যাতায়াত তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই টিকিট কাটতে না পারার জন্য এই মহিলাদের পুলিশ ও টিকিট পরীক্ষকদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়। একারণেই এদের জন্য ২৫ টাকার মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা, এই দুটি সংগঠন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চালু করতে পেরেছে, যদিও সর্বত্র এখনও কর্তৃপক্ষ তা চালু করেনি। এ ব্যাপারে মহিলা কমিশনকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সংগঠন দু'টির পক্ষ থেকেই আবেদন জানানো হয়। তাঁরা বলেন যে, অল্পমূল্যে মাসিক টিকিট পাওয়ার প্রশ্নে মাসিক আয়ের সীমা ৪০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারেও কমিশনকে তৎপর হওয়ার জন্য তাঁরা অনুরোধ জানান।

অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে বলা হয় — (১) মহিলা কামরার সংখ্যা বাড়ানো দরকার, (২) মহিলা কামরায় শৌচাগারের ব্যবস্থা করা দরকার, (৩) সব স্টেশনেই শৌচাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, (৪) মহিলাযাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত, (৫) টিকিট পরীক্ষার সময় মহিলাদের সাথে অশালীন ব্যবহার বন্ধ হওয়া উচিত।

শহীদ আব্দুল ওদুদ স্মরণসভা

গত ২৯ মে অনুষ্ঠিত হল শহীদ কমরেড আব্দুল ওদুদের ৭ম স্মরণসভা। '৯৮ সালের এই দিনেই এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ও তেহট্ট থানার অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা, শিক্ষক কমরেড আব্দুল ওদুদকে পৈশাচিক নৃশংসতায় হত্যা করে সিপিএমের ঘাতকবাহিনী। প্রতি বছরের মতো এবছরও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বারুইপাড়া বাজারে অবস্থিত 'বীর শহীদ কমরেড আব্দুল ওদুদ স্মৃতিভবনে'র সামনে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় সমবেত হন এলাকার সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ।

এলাকার বিভিন্ন গণসংগঠন, পার্টি কমিটি, সাধারণ মানুষ ও দলের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শহীদের সমাধিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার সূচনা হয়। শুরুতেই টেপ রেকর্ডারে সংরক্ষিত শহীদ কমরেড আব্দুল ওদুদের একটি গান বাজিয়ে শোনানো হয়। প্রয়াত প্রিয় কমরেডের অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে নীরব কান্নায় ভেঙে পড়েন বহু মানুষ। গোটা সভায় বিরাজ করে গভীর নৈঃশব্দ।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন, সভার সভাপতি এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলার বিশিষ্ট জননেতা কমরেড খোদা বক্স, প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান এবং 'বীর শহীদ কমরেড আব্দুল ওদুদ স্মৃতিভবন রক্ষা কমিটির সম্পাদিকা, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা, শহীদ কমরেড আব্দুল ওদুদের বোন কমরেড ইসমত আরা খাতুন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়।

নদীয়ায় ত্রাণ শিবির

শিশু, নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধাসহ ধাপাড়িয়া গ্রামের ২৫০টি পরিবার বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল গত ৯ মে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি তখন ভোটের উন্মাদনায় মত্ত। খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকা মানুষগুলির প্রতি কারোরই ভ্রূক্ষেপ নেই। কমরেড মিলন মজুমদারের নেতৃত্বে স্থানীয় এস ইউ সি আই কর্মীরাই অসহায় মানুষগুলিকে নিয়ে যান বিডিও'র কাছে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে। বিডিও আইন দেখালেন — নির্বাচনের রায় প্রকাশিত হওয়ার আগে কিছু করার নেই। অবশেষে এম এস এস, ডি এস ও এবং এস ইউ সি আই কর্মীরাই ১২ মে থেকে আশপাশের এলাকা থেকে ত্রাণসংগ্রহ করে ১০ কুইন্টল চাল, ৪ হাজার জামা-কাপড়, গৃহ নির্মাণের জন্য ৫০০ বাঁশ ইত্যাদি বিতরণ করেন। কমরেড কোরবান আলী সেখ, লক্ষ্মী ঘোষ, নেপাল দাস, বকুল দফাদার, বক্স দফাদার, চাঁদু সেখ, জগন্নাথ ঘোষ, এয়ার আলী, সায়েত মুন্সী, সফি সেখ, প্রমুখের উদ্যোগে সংগঠিত ত্রাণশিবির উদ্বোধন করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড খোদাবক্স।

ত্রাণ শিবিরে কমরেড খোদা বক্স

উত্তর দিনাজপুর

ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে জয়

উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার ঝাড়বাড়ি জুনিয়র হাইস্কুলে ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। সারা জেলা জুড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করেছে, আর সেই সুযোগে স্কুল কর্তৃপক্ষ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির ফি ২৫০ টাকা করে আদায় করেছিল। এ খবর পাওয়ার পরেই এ আই ডি এস ও'র জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে ফি কমিয়ে ভর্তি চালু রাখার দাবি জানানো হয়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তির কাজ বন্ধ করে দেয়। গড়ে ওঠে অভিভাবক ফোরাম। এ আই ডি এস ও-র কর্মী হৃদয় রায়, জামিরুল ইসলাম, নন্দন পালের নেতৃত্বে স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে আলোচনায় বসার জন্য দাবি জানানো হয়। গত ২৫ মে প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে স্কুল পরিচালন কমিটি অভিভাবক ও ছাত্রনেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় অভিভাবকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন গোপাল পাল, বিমল পাল প্রমুখ। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি এস ও-র জেলা সভানেত্রী কমরেড মাধবীলতা পাল। দীর্ঘ আলোচনা ও তীব্র বাদানুবাদের পর স্কুল কর্তৃপক্ষ ১৫০ টাকায় ভর্তি নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। উপস্থিত অভিভাবকরা এই জয়ে আন্দোলনের ওপর গভীর আস্থা পোষণ করেন এবং আগামী দিনে শিক্ষার অন্যান্য দাবিতে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

দ্বিদলীয় পরিষদীয় রাজনীতি

জনগণকে সংসদীয় চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ফেলার বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র

স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ তিরিশ বছর কংগ্রেস একক দল হিসাবে একটানা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় থাকার পর ১৯৭৭ সাল থেকে প্রথম এদেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূচনা হয়। তারপর এদেশের মানুষ কেন্দ্রের ক্ষমতায় এক দলের শাসনের পরিবর্তে বিভিন্ন জোট বা দলের আসা যাওয়া দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যগুলিতে অবশ্য এ জিনিস আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আসরে অনেক প্রতিপক্ষ থাকলেও আদতে ভোটের লড়াইয়ে ছবিটা হয় দ্বিদলীয়। একপক্ষ সরকারে, ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছে; অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ, মানুষের সরকার বিরোধী মনোভাবকে ভর করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। অর্থাৎ একদলীয় পরিষদীয় শাসনের জায়গায় চলছে দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ দেখে বলে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী শোষণ ও সংকটের চাপে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের মধ্যে সরকারবিরোধী ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এই ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে একসময় এমন তীব্র রূপ নেয় যে, যে দল ক্ষমতায় থাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে তাকে ক্ষমতায় রেখে পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষণজাত জনগণের এই তীব্র ক্ষোভ যাতে যথার্থ বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনের ধারবাহিকতায় শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পথে চলে না যায় সেই ভয়ও পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে প্রবলভাবে থাকে। এই বাস্তব সম্ভাবনার হাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য থেকে বুর্জোয়ারা জনসাধারণের রাজনৈতিক অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে বুর্জোয়াদেরই অপর একটি দলকে বিরোধী হিসাবে খাড়া করে জনসাধারণের বিক্ষোভকে নির্বাচনী চৌহদ্দির মধ্যে আটকে দেয় এবং ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দলকে হারানো এবং বিরোধী আসনে থাকা অপর বুর্জোয়া দলকে জেতানোর মধ্য দিয়ে জনতার বিক্ষোভের সমাপ্তি ঘটায়। এতে অক্ষত থাকে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ফলে একটা বুর্জোয়া দলকে সরিয়ে অপর একটি বুর্জোয়া দলকে ক্ষমতায় আনার যে দ্বিদলীয় রাজনীতি চলছে তার দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, পরন্তু দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির আড়ালে বুর্জোয়া শোষণশাসনকে দীর্ঘায়িত করে এবং শোষণমুক্তির সংগ্রামকে শুধু বিপথগামী করে তাই নয়, 'ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার পাল্টে সমস্যার সমাধান সম্ভব' — এরকম একটা মোহ বাড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণকেও প্রতারণা করে।

স্বাধীনতার পর একটানা কংগ্রেস শাসন চলতে চলতেই দেশের মানুষের মধ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ আর বিক্ষোভ লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠী, অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণী এদেশে দ্বিদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করার প্রয়াস চালাতে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই কংগ্রেস বিরোধিতা চূড়ান্তরূপে ফেটে পড়ে ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ভারতজুড়ে ইন্দিরা কংগ্রেসবিরোধী মারমুখী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে; যাকে লাঠি, গুলি পুলিশ দিয়ে দমন করতে না পেরে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে গোটা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। ফল হয় আরও মারাত্মক। দেশ জুড়ে ইন্দিরা- বিরোধী ক্ষোভ আরও মারাত্মক বৃদ্ধি পায় এবং কংগ্রেস জনসাধারণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় '৭৭ সালে নির্বাচনের মুখে ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে কৃত্রিমভাবে প্রচার চালিয়েও তাকে পুনরায় ক্ষমতায় বসানো সম্ভব নয় দেখে এবং কংগ্রেসের বিকল্প জাতীয় স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণীরই অপর কোন একটি শক্তিশালী দল বা জোট না থাকায় বুর্জোয়াশ্রেণী পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে রাতারাতি জনসংঘ (বিজেপির পূর্বনাম), সংগঠন কংগ্রেস, বি এল ডি প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দল এবং সোস্যালিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের নিয়ে 'জনতা দল' খাড়া করে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে বিজয়ী করে। ফলে কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আন্দোলনের রূপে যে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল, তা বুর্জোয়াশ্রেণী প্রশমিত করতে সক্ষম হয়। সূচনা হয় দ্বিদলীয় রাজনীতির।

সেই সময়েই এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে, এক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বলেছিল, ''…বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনকালে … পুঁজিবাদী সঙ্কটের সমস্ত বোঝা মেহনতী মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্যকলাপগুলি সাধারণ মানুষের মনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুধু চূড়ান্ত অসন্তোষই সৃষ্টি করেনি — তীব্র ঘৃণা, ক্রোধ ও বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। … শ্রীমতী গান্ধীর সরকার জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।… জনসাধারণের তীব্র কংগ্রেস বিরোধী ঘৃণা ও অসন্তোষ বিরাট বিস্ফোরণের রূপে ফেটে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী, অন্তত তাদের একটা বড় অংশ, জনসাধারণের এই কংগ্রেস বিরোধী মানসিকতাকে পুঁজিপতিশ্রেণীরই স্বার্থরক্ষাকারী অন্য একটি নতুন বিকল্প দলের পক্ষে প্রবাহিত করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদকে শুধু জনরোষ থেকে রক্ষা করাই নয়, জঙ্গি বামপন্থী ও বিপ্লবী গণআন্দোলন গড়ে ওঠার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনাকে রোধ করতে চেয়েছে।… শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আন্তরিক প্রচেষ্টা পূর্বে বারবার ব্যর্থ হলেও লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, বি এল ডি প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দল এবং এস পি ও শাসক কংগ্রেস দল থেকে বিতাড়িত কিছু সদস্যকে নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এক বিরাট অংশের সাথে ব্যবসায়ী মহল, আঞ্চলিক পুঁজি ও গ্রামীণ বুর্জোয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থ সাহায্যে যেভাবে জনতা পার্টি গড়ে ওঠে এবং সাথে সাথে একচেটিয়া মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলিতে এই পার্টির পক্ষে যে ঢালাও প্রচার চালানো হয়, তা লক্ষ্য করলে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।… দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বপ্রথম দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের রূপ দিতে যখন সক্ষম হয়েছে, তখন সংসদীয় রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ফেলে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগকে তারা ক্রমাগত সঙ্কুচিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।'' (কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃত, গণদাবী ২৪ এপ্রিল ১৯৭৭) ২৭ বছর পরে আজও এই বিশ্লেষণের যথার্থতা মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই নতুন করে উপলব্ধি করতে পারছেন।

ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী শুধু কেন্দ্রে নয়, রাজ্যে রাজ্যেও এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আনার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন থেকেই চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস বনাম বিজেপি, কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস বনাম আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে বিজেপি জোট, কিছু ক্ষেত্রে বাম জোট বনাম কংগ্রেস, বা কংগ্রেস জোট বনাম বিজেপি জোট প্রভৃতি নানারকম বিন্যাস ও সমন্বয়ে এই দ্বিদলীয় রাজনীতিকে পাকাপাকি রূপ দেবার চেষ্টা চলছে। '৭৭ সালে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু করার প্রয়াস শুরু হলেও অন্যান্য কারণের সাথে মূলত কংগ্রেসের বিকল্প জাতীয় স্তরে বুর্জোয়াদেরই অন্য একটি শক্তিশালী দল গড়ে না ওঠায় তা একটা সুস্পষ্ট রূপ নিতে পারছিল না। অবশেষে বহু প্রচেষ্টা, পরীক্ষানিরীক্ষা ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে বর্তমানে একদিকে কংগ্রেস ও অন্যদিকে বিজেপি, বুর্জোয়াদের এই দুই বিশ্বস্ত দলের নেতৃত্বে জোটকে কেন্দ্র করে জাতীয় স্তরে দ্বিদলীয় রাজনীতি পাকাপাকিভাবে চালু করার বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিকল্পনা একটা বাস্তব রূপ পেতে চলেছে; যদিও এটাই স্থায়ী রূপ নেবে কিনা তা আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে।

'৭৭ সালে জনতা সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার সূচনা হলেও প্রথমেই তা ধাক্কা খায়। ক্ষমতাসীন হওয়ার ৩৬ মাসের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এই সরকারের পতন ঘটে এবং জনতা দল ভেঙে যায়। ফলে ১৯৮০ সালে লোকসভার আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে এই দ্বিদলীয় রাজনীতির পথ বেয়েই মাত্র তিন বছর আগে জনগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত ইন্দিরা কংগ্রেস পুনরায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৮৪ সালে নিজের বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পর যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচনে ইন্দিরা সহানুভূতির প্রবল হাওয়ায় রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পুনরায় বিপুলভাবে জয়ী হয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসে। কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণের কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনজীবনে সঙ্কটবৃদ্ধির সাথে সাথে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষও ঘনীভূত হতে থাকে। এর সাথে বোফর্স কেলেঙ্কারিতে রাজীব গান্ধীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় এবং তাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের আন্দোলনের ফলে দেশজুড়ে পুনরায় তীব্র কংগ্রেস বিরোধী ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের আবার পরাজয় ঘটে। নির্বাচনের পর একদিকে সিপিএম-সিপিআই প্রভৃতি বামপন্থী দল এবং অন্যদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপির যৌথ সমর্থনে রাজীব মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসা ভি পি সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে জনমোর্চা সরকার গঠিত হয়। কিন্তু অন্তর্কলহে এবং বিজেপি হঠাৎ সমর্থন তুলে নেওয়ায় ১১ মাসের মধ্যেই এই সরকারের পতন ঘটে। দল ভেঙে চন্দ্রশেখর কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠন করেন। সেই সরকারেরও মৃত্যু ঘটে চার মাসের মধ্যে। ফলে ১৯৯১ সালে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাংসদ কেনাবেচা প্রভৃতি নানান খেলার মধ্য দিয়ে নরসীমা রাও কোনক্রমে পাঁচ বছর সরকার চালাতে সক্ষম হন।

১৯৮৪ সালের রাজীব গান্ধীর সরকার থেকে ১৯৯১ সালের নরসিমহা রাওয়ের সরকারের অল্প সময়ের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রত্যক্ষ মদতে এবং পরিস্থিতিকে চতুরভাবে কাজে লাগিয়ে বিজেপি একক দল হিসাবে প্রভূত শক্তি বাড়িয়ে নেয়। আজ বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেস, বিশেষ করে সিপিএম যত গরম গরম কথাই বলুক, বিজেপি'র এই শক্তিবৃদ্ধির পেছনে এই দুই দলেরই অবদান ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না। যে কংগ্রেসকে সিপিএম আজ ধর্মনিরপেক্ষ বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, সেই কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট কব্জা করার জন্য ১৯৮৬ সালে বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে রামলালা পূজার সূচনা করে। বিজেপি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সেখানে রামমন্দির নির্মাণের নামে শিলাপূজার কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশব্যাপী উগ্র হিন্দুত্বের বন্যা বইয়ে দেয়। এর ফলে ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যে বিজেপি মাত্র ২টি আসনে জিতেছিল, ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে সেই বিজেপির আসনসংখ্যা এক লাফে বেড়ে দাঁড়াল ৮৬। আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে সরকার গঠনে এই চরম সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র সাথেই সিপিএম পরোক্ষে হাত মিলিয়ে তার কুৎসিত মুখটাকে আড়াল করে জনসাধারণের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করতে সাহায্য করার দ্বারা বিজেপি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তার শক্তি আরও বাড়িয়ে নেয়। ফলে ১৯৯১ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার সাংসদ সংখ্যা আগের থেকেও বেড়ে দাঁড়ায় ১১৯।

সিপিএম আজ বলছে, তারাই নাকি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। অথচ ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে বিজেপি-র সাথে হাত মেলানোর দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার সাথে তারা আপস করেনি ? তাছাড়া কংগ্রেস যেমন নরসিমহা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে বাধা না দিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে, তেমনি পুরুলিয়া জেলার ওপর দিয়ে আদবানীর সাম্প্রদায়িক রথযাত্রা বিনা বাধায় যেতে দিয়ে সিপিএম-ও কি একই ভূমিকা পালন করেনি ? যে কাজ বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবের সরকার করতে পেরেছিল, তাকে বামপন্থার শক্ত জমি পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের আটকাতে বাধা ছিল কোথায় ? এই নাকি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের আপসহীন সংগ্রাম ! যাইহোক, কংগ্রেস ও সিপিএমের এইসব ভূমিকার জন্যই এবং দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনের অনুপস্থিতির সুযোগে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে বিজেপি প্রভূত শক্তি বাড়িয়ে জাতীয় রাজনীতির সামনের সারিতে চলে আসে। ফলে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজেপির সাংসদ সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৮। কিন্তু বেশি আসন পাওয়া সত্ত্বেও একক দল হিসাবে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতা সে পায়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকার গঠন করে ১৫ দিনের মধ্যে অন্য দলের সমর্থন এবং

চারের পাতায় দেখুন

গণআন্দোলনের আঘাতে বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করুন

তিনের পাতার পর

সাংসদ ভাঙিয়ে আস্থা ভোটে জেতার চেষ্টা বিজেপি করে। কিন্তু এতে সফল না হওয়ায় ১৩ দিনের মধ্যেই বাজপেয়ী সরকারের পতন ঘটে।

এই অবস্থায় কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের সমর্থনে দেবেগৌড়ার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারও ১০ মাসের বেশি টেকেনি। দেবেগৌড়ার পর ঐ একই সমর্থনের ভিত্তিতে আই কে গুজরালের প্রধানমন্ত্রীত্বে আট মাস কোয়ালিশন সরকার চলে। শেষে কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ওই সরকারেরও পতন ঘটে। ফলে যুক্তফ্রন্ট বা তৃতীয় ফ্রন্ট বুর্জোয়াদের পছন্দসই বিকল্প হিসাবে আসতে চাইলেও নানাভাবে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বিজেপির শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বুর্জোয়ারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে বিজেপিকে তুলে ধরার সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সালে নির্বাচনে ১৮২টি আসন পেয়ে অন্য কয়েকটি দলের সহযোগিতায় বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি জোট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু জয়ললিতার এ ডি এ এম কে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ১৩ মাসের মধ্যেই এই সরকার মুখ থুবড়ে পড়ে। সেই সময় বিরোধী দলগুলি সম্মিলিতভাবে কোন সরকার তৈরি করতে পারে কিনা, তার একটা চেষ্টা হয়। কংগ্রেস চেয়েছিল সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে এককভাবে সরকার গঠন করবে, বাকিরা বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে। কংগ্রেস বলেছিল, ইতিপূর্বে প্রতিবারই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন করেছে; এবার বাকিরা তাদের সমর্থন করুক। কিন্তু বাকি দলগুলি তাতে রাজি হয়নি। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের রেষারেষিকে কেন্দ্র করে সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম সিং-এর সাথে কংগ্রেসের বিরোধ তীব্র রূপ নেয়। মুলায়ম সিং বলে বসেন, সোনিয়া বিদেশিনী, অতএব ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে মেনে নেওয়া যায় না। এই প্রশ্নকে ঘিরে কংগ্রেসেও ভাঙন দেখা দেয়। মহারাষ্ট্রের প্রভাবশালী নেতা শারদ পাওয়ার ও লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার পি এ সাংমার মত নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এন সি পি) গড়ে তোলেন। কংগ্রেসের তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। ফলে কংগ্রেস ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে শক্তিশালী বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে পারেনি। তদুপরি সোনিয়ার নেতৃত্বে দলের পাঁচমারি অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় — কোয়ালিশন সরকার একটা ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত, কংগ্রেস কোন কোয়ালিশনে যাবে না, একাই লড়বে। এই অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস এককভাবে লড়াই করে পরাজিত হয়। আর পুঁজিপতিশ্রেণীর অর্থ ও তাদের সমর্থনপুষ্ট প্রচারমাধ্যমের অকৃপণ ঔদার্যের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিজেপি এন ডি এ জোট গঠন করে দিল্লির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল করে।

যাই হোক, কয়েক বছরের শাসনেই বিজেপির স্বরূপ মানুষের চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। মানুষ বুঝতে পারে, একদিকে বিজেপির মূল্যবোধের রাজনীতির অর্থ নেতা-নেত্রী, সাধু-সাধ্বীর অবারিত দুর্নীতি, মিথ্যাচার, বাবরি-মসজিদ ভাঙার মত সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, গুজরাট দাঙ্গার মতো নৃশংস গণহত্যা, আর এস এস-এর হিন্দুত্ববাদের ধাঁচে ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস পাঠ্যবইকে বিকৃত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র, পুরোহিততন্ত্র মায় গুপ্তবিদ্যা চালু করার মত বিজ্ঞানবিরোধী পশ্চাৎমুখী মারাত্মক নানা পদক্ষেপ। অন্যদিকে, বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নামে ছাঁটাই, লে-অফ, ভিআরএস, পদলোপ, বেসরকারীকরণের মাধ্যমে বেকারসমস্যাকে তীব্র করা, চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি গরিব মধ্যবিত্তের ওপর সবরকম করবৃদ্ধি, জমা টাকা, পি এফ-এর সুদ হ্রাস ইত্যাদি তো আছেই, তার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তুলে আমেরিকা তোষণ। এই হল বিজেপির রাজনীতির সংক্ষিপ্ত খতিয়ান।

পুঁজিপতিদের আস্থা অর্জন করে সরকারি ক্ষমতায় গিয়ে এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য পুঁজিপতিদের সেবা করার মূল প্রশ্নে বিজেপি চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী যে সমস্ত আর্থিক নীতি অনুসরণ করেছে তার সাথে কংগ্রেসের নীতিগত কোন প্রভেদ নেই। যে বিশ্বায়ন-উদারীকরণের পথ ধরে বিজেপি সাধারণ মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে তার সবগুলোরই সূত্রপাত তো মনমোহন-রাজীব-নরসীমা রাও-এর কংগ্রেসী রাজত্বে। এমনকী যে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী রাজনীতির জন্য বিজেপি আজ দেশ-বিদেশে ধিক্কৃত, সেই ঘৃণ্য রাজনীতি কংগ্রেসও ভোটের প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো, অপছন্দের রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়া, কাশ্মীর সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে সন্ত্রাসবাদে মদত, পাঞ্জাবে ভিন্দ্রানওয়ালের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে ব্যবহার করে অকালিদের কোণঠাসা করা, আবার ঐ শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে ইন্দিরা হত্যার পর শিখ নিধন যজ্ঞের আগুনে রাজীবের নির্বাচন জেতা, অসংখ্য ঘুষ-দুর্নীতি-কেলেঙ্কারি, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেওয়া — এই সমস্ত কুকর্মের হোতা খোদ কংগ্রেস। অথচ, দ্বিদলীয় রাজনীতির মাধ্যমে এই দুই দলকেই বা এই দুই দলের নেতৃত্বে জোটকেই পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় বসিয়ে চরম সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে বুর্জোয়াশ্রেণী দীর্ঘায়িত করতে চাইছে।

এই পরিস্থিতিতে বামপন্থী শক্তিগুলির সামনে কর্তব্য কী ছিল? পুঁজিপতিশ্রেণীর এই দলগুলি কখনই যে জনগণের স্বার্থরক্ষা করে না, করবে না — এই সত্যকে তুলে ধরে পুঁজিপতিদের চক্রান্তের স্বরূপ দেখিয়ে দেওয়া ও সাথে সাথে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছিল জরুরি কর্তব্য। অথচ তার পরিবর্তে দেশের সর্ববৃহৎ বামপন্থী দল হিসাবে সিপিআই(এম) কী ভূমিকা নিয়েছে? তারা কংগ্রেস সহ অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া গড়ে তুলেছে। তিন রাজ্য বাদে অন্যত্র কংগ্রেসকে ভোটদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এইভাবে বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দলীয় সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে সরকার গঠনে বাইরে থেকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এই বুর্জোয়া সরকারের স্থায়ীত্বের গ্যারান্টার হয়েছে। এইভাবে সিপিএম জনগণকে ঠকিয়ে নিরঙ্কুশ শোষণ চালাবার বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের চক্রান্তেরই অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

ফলে জনসাধারণকে আজ বুঝতে হবে, কংগ্রেস জোট ও বিজেপি জোট — দুই বুর্জোয়া বিকল্পকে পালাক্রমে নির্বাচিত করার দ্বারা জনজীবনের সমস্যার সুরাহা হবে না। কারণ সমস্ত সমস্যার মূল কারণ যে পুঁজিবাদ, সেই পুঁজিবাদকেই টিকিয়ে রেখে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে এরা মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। আর বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণকে প্রতারিত করে দ্বিদলীয় রাজনীতির মাধ্যমে এদেরই পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় বসিয়ে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভকে নির্বাচনের মধ্যে আটকে দিয়ে গণআন্দোলন তথা বিপ্লবের হাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করে। তাই দেখা যাচ্ছে, বিজেপি ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে, পরবর্তী নির্বাচনে তারা জিতবে। কারণ তারা জানে কংগ্রেস পাঁচ বছরের জন্যও যদি ক্ষমতায় টিকে থাকে, যদিও তার সম্ভাবনা কম, তাদের মতো একইভাবে অচিরেই জনসাধারণের বিক্ষোভের সামনে পড়বে। আর তাকে পুঁজি করেই বিজেপি আবার জিতবে, আবার একই জনবিরোধী শাসনের পুনরাবৃত্তি হবে।

গরিব চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত মানুষকে আজ তাই ভেবে দেখতে হবে, পুঁজিপতিশ্রেণীর এই দ্বিদলীয় রাজনীতির স্বরূপটাকে যদি তাঁরা ধরতে না পারেন এবং শাসকশ্রেণী যা চাইছে, তার পাল্টা প্রবাহে অর্থাৎ দুর্বার গণআন্দোলনের আঘাতে এই রাজনীতিকে যদি পরাস্ত না করতে পারেন, তাহলে তাদের আজ এক বুর্জোয়া দল, কাল তাকে পছন্দ না হলে আরেক বুর্জোয়া দল বা গোষ্ঠীকে ভোট দিয়ে সরকারে পাঠানোর চক্করেই ঘুরে মরতে হবে। এ হচ্ছে তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। এতে বাড়বে শুধু নিজেদের দুর্দশা, পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড়, আর তার ভাগীদার হিসাবে তল্পিবাহক রাজনৈতিক নেতাদের আখের গোছানোর বহর।

এই অবস্থায় বুর্জোয়াদের দ্বিদলীয় রাজনীতির এই চক্রাকার আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনগুলিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার পথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোই তাদের বর্তমান মুহূর্তে একমাত্র কর্তব্য। এছাড়া জনসাধারণের সামনে আর কোন সঠিক পথ নেই।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন

একের পাতার পর

নিয়ে দাঙ্গার অভিযোগ রয়েছে এবং তৃতীয় কংগ্রেস প্রার্থী বিট্টলভাই ডাকাতি, রাহাজানি, তোলাবাজি সহ কমপক্ষে ১৪টি অপরাধের ঘটনায় অভিযুক্ত।

শুধু লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীই নয়, এন ডি এ মন্ত্রীসভার মতো এবারেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আলো করেছেন যাঁরা, তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধেই আছে মারাত্মক অভিযোগ। বহু টানাপোড়েনের পর রেলমন্ত্রক হাতে পাওয়া লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির ৬১টি মামলা চলছে। তাঁর বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিপুল সম্পদ রাখার অভিযোগও রয়েছে, তদন্ত চালাচ্ছে সি বি আই। লালুপ্রসাদ ছাড়াও বিহার রাজ্য থেকে মন্ত্রী হয়েছেন আরো যে ৯ জন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনই হলেন দাগী অপরাধী। এদের কেউ ভুয়া বি-এড সার্টিফিকেট প্রদান চক্রের পাণ্ডা, কেউ বা কুখ্যাত 'ডন' দাউদ ইব্রাহিমের সাহায্যকারী। বিহারের এই পাঁচ অপরাধী মন্ত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত হল মহম্মদ তসলিমউদ্দীন। এর বিরুদ্ধে রয়েছে ডাকাতি, ঠগবাজি ও ধর্ষণের মতো কমপক্ষে ১০টি মারাত্মক অভিযোগ। মন্ত্রীসভায় আছেন শিবু সোরেন — যাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা ঘুষ নেবার অভিযোগ। এই সমস্ত অভিযুক্তদের সদর্পে সংসদে পদার্পণ করতে দেখে উৎসাহিত হয়ে কুখ্যাত অপরাধী খুন, অপহরণ, বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত মহম্মদ সাহাবুদ্দিন বিহারে সিওয়ানে তাঁর কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই নিজের জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে দলনেতা লালুপ্রসাদ যাদবের কাছে মন্ত্রীত্বের আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন তসলিমউদ্দিন, শিবু সোরেন এবং স্বয়ং লালুপ্রসাদ যাদব মন্ত্রী হতে পারলে তাঁর মন্ত্রী হতে বাধা কোথায়।

এদিকে, মন্ত্রীসভায় ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা স্থান পেলেন কী করে — এ প্রশ্নের জবাবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সাফাই গেয়ে বলেছেন, ''কেবলমাত্র অভিযুক্ত হলেই কাউকে দোষী বলা যায় না, যতক্ষণ না আদালতে অপরাধ প্রমাণ হয়।'' আইনের বিচারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক। কিন্তু নৈতিকতার বিচারে? নীতির বিচারে তাঁর কথা ধোপে টেঁকে কি? আদালতে অপরাধ প্রমাণ হোক বা না হোক, রাজ্যের আপামর সাধারণ মানুষ নিজেদের দুঃসহ অভিজ্ঞতায় যাদের অপরাধী বলে জানে, তাদের প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড় করানোটা কোন্ নৈতিকতার পরিচয়? বিচার চলাকালীন তাঁদের মন্ত্রীসভায় স্থান না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যদি রায়ের জন্য অপেক্ষা করতেন, তাহলে 'দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন' দেবার যে দাবি সরকার তুলেছে তাকে কিছুটা অন্তত আন্তরিক বলে মনে করা যেত।

অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এই সুযোগে নিজেদের আবার প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য ময়দানে নেমে পড়েছে। মন্ত্রীসভায় অভিযুক্তদের স্থান দেওয়ার প্রতিবাদে সদ্য গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে তারা এখন সোচ্চার। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তারা রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ জানিয়ে এসেছে। অথচ মহারাষ্ট্রের আহির হংসরাজ গঙ্গারাম বা গুজরাটের নীতিশভাই প্যাটেলের মতো প্রায় ডজনখানেক কুখ্যাত অপরাধীকে তারা নিজেরাই এবার ভোটে দাঁড় করিয়েছিল।

এ প্রশ্নে সিপিএমের ভূমিকা চূড়ান্ত লজ্জাজনক। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস তাঁদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে অম্লান বদনে বলে দিয়েছেন, — ''এরকম কাউকে (মন্ত্রী) না করলেই ভাল হতো। কিন্তু কংগ্রেস জোট কাকে মন্ত্রী করবে, সেটা আমরা ঠিক করে দিতে পারি না।'' (গণশক্তি ৫-৬-০৪)। অথচ ক'দিন আগেই ২৩ মে ময়দানে প্রকাশ্য সভায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন — ''আমরা চেয়েছিলাম বামপন্থীরা কেন্দ্রে নীতি-নির্ধারক শক্তি হোক্, তা হয়েছে। আমাদের সমর্থনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন যে সরকার গঠিত হয়েছে, সেখানে আমরা 'হ্যাঁ' বললে এগোবে, আমরা 'না' বললে দাঁড়িয়ে থাকবে, এক পাও এগোতে পারবে না।'' (গণশক্তি ২৪ মে, ২০০৪) কেন্দ্রের সরকারের ওপর এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দাগী অপরাধীদের মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাকে ভাড়াটে সেনা
যুদ্ধও একটা ব্যবসায়িক পণ্য

ইরাকে বীর জনসাধারণের বজ্রকঠিন প্রতিরোধের সামনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের লেজুড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ ছিন্নভিন্ন দিশেহারা। তাদের সমরশক্তির দম্ভ চুরমার। জনগণ লড়াইয়ে নামলে কোন সমরশক্তিই যে দুর্ভেদ্য নয়, কোন মারণাস্ত্রই অপ্রতিরোধ্য নয়, ভিয়েতনামের পর ইরাকে আবার তা প্রমাণিত — যা বিশ্বের জনগণ দেখছে, আনন্দিত, উল্লসিত হচ্ছে। ইরাকি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলদারবিরোধী অভিযানে নিহত মার্কিন-ব্রিটিশ সৈন্যদের শত শত কফিনের মিছিল নিত্যদিনের ঘটনা। জনসাধারণের স্বজনহারানো বুকফাটা আর্তনাদ সঞ্জাত ক্রোধে শাসকদের হৃদয়ের রক্ত হিমাঙ্কের নিচে। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত সংবাদমাধ্যমগুলো শত চেষ্টাতেও এই কফিন-মিছিলের খবর গোপন করতে পারছে না। মার্কিন সামরিক সদর কার্যালয় পেন্টাগন মার্কিন সৈন্যদের মৃত্যুর খবর ও তাদের মৃতদেহের ছবি প্রচারের বিরুদ্ধে সমস্ত সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর, সাংবাদিকদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছে — কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য চাপা থাকছে না। শুধু ১৪ এপ্রিলেই ৩০০-র বেশি মৃত সৈনিকের কফিন আমেরিকার মাটিতে পৌঁছানোর ছবি প্রকাশিত হয়ে যাবার পর দিশেহারা মার্কিন শাসকরা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাদের রাগকে প্রশমিত করার জন্য মৃতদেহগুলি দেশের মাটিতে পৌঁছে দিতে চুক্তিবদ্ধ মার্কারি এয়ার গ্রুপ কর্পোরেশনের অধীন মেস্ট্যাগ এয়ার কর্পোরেশন তাদের দুজন কর্মচারীকে বলির পাঁঠা করে বরখাস্ত করেছিল। এই ছবি প্রকাশের ফলে নাকি মৃত সৈনিকদের পরিবারের গোপনীয়তা নষ্ট হয়েছে। এমনই 'মহান গণতন্ত্র' কায়েম করেছে মার্কিন শাসকরা যে, দেশের নাগরিকদের কাছে তাদের সৈন্যদের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে দেবে না !

চেপে যাওয়ার নিপুণ চেষ্টা সত্ত্বেও নানাভাবে প্রকাশিত মার্কিন সৈন্যদের ব্যাপক মৃত্যুর ঘটনা মার্কিন প্রশাসনের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই শাসকরা আর একটা হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যার নগ্ন চেহারা সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা একটা ঘটনার সূত্র ধরে।

গুণ্ডামি ও দস্যুবৃত্তিকে হাতিয়ার করে ইরাককে জবরদখল করার পর হাজার হাজার নিরীহ ইরাকি জনসাধারণকে নিজেদেরই বাসভূমিতে যখন মার্কিন সেনারা হত্যা করেছে, জেলে জেলে জঘন্য অত্যাচার করেছে, ঘরে ঘরে ঢুকে নির্বিচারে নারীধর্ষণ করেছে, তার একটা ছবিও 'মুক্ত', 'স্বাধীন' সাংবাদিকতার ইজারাদার মার্কিন বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম বা সংবাদপত্র প্রকাশ করে না। ইরাকের বিভিন্ন জেলে বন্দীদের উপর মার্কিন সেনাদের নারকীয় অত্যাচারের ছবি আমেরিকার নানা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে মার্কিনী বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের কোন মহিমা নেই, রয়েছে শাসকশ্রেণীরই একটি অংশের পরিকল্পনা। আসলে ইরাকি গণপ্রতিরোধের সামনে পড়ে মার্কিন সেনাদের শোচনীয় অবস্থা, মার্কিন সেনার কফিনের সংখ্যাবৃদ্ধিতে মার্কিন সামরিক শক্তির 'অপরাজেয়তা'র ধারণায় প্রবল আঘাত সেনা কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের নানা মহলের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব-বিরোধের জন্ম দিয়েছে। দু'দিনেই ইরাককে মার্কিন কব্জায় নিয়ে আসার কথা যারা বলেছিল, এবার তাদের তাক করা হচ্ছে। এক অংশ এজন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড, সহকারী ওলফোউইটজ্‌ ও জেনারেল মায়ার্সকে দায়ী করে এদের পদত্যাগের দাবি তুলিয়ে দিয়েছে। অত্যাচারের ছবিগুলোও প্রকাশ করা হল এই তিন কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জোরালো করার জন্যই। এমন দু-একজন কর্তার অপসারণে শাসকশ্রেণীর মূল লক্ষ্যের কোনও ক্ষতি হয় না, বরং এদের বলির পাঁঠা করে শাসকশ্রেণীকে জনগণের চোখ থেকে আড়াল করা সম্ভব হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, অপরাধ নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে, অথচ এই মূল প্রশ্নটাই কেউ তুলছে না যে, সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে ইরাককে দখল করে রাখা, অবিলম্বে যেটা বন্ধ করা দরকার। যাই হোক, মার্কিন শাসকদের 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' সংবাদমাধ্যমে কিছুদিন আগে হঠাৎ চারজন 'আমেরিকাবাসী'র মৃত্যুর সংবাদ দূরদর্শনে, সংবাদপত্রে ফলাও করে দেখানো হল ইরাকি গেরিলাদের নৃশংসতা প্রমাণের জন্য। ইরাকি মুক্তিযোদ্ধারা দখলদার মার্কিন সেনাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার বিরোধী এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি থেকে এই চারজন আমেরিকানকে হত্যা করে শুধু পুড়িয়েই দেয়নি, তাদের পোড়া মৃতদেহগুলো ফালুজার একটি সেতুর ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছিল। এতে মার্কিনী শাসকদের 'হৃদয়' নাকি ব্যথায় উদ্বেল হয়েছিল, তাদের 'আত্মসম্মানে' আঘাত লেগেছিল। মার্কিন জনগণের এই মানসিক আঘাত স্বাভাবিক এবং সহানুভূতির যোগ্য। কিন্তু মার্কিন শাসকদের এই মায়াকান্না এক নিকৃষ্ট ভণ্ডামি ছাড়া আর কী ? অতীতের কথা ছেড়ে দিলেও সাম্প্রতিককালে কিউবায় দখলীকৃত গুয়ান্টানামো দ্বীপে, আফগানিস্তানিদের ওপর এবং সদ্য প্রকাশিত ইরাকের আবু ঘ্রাইবের কারাগারে, বসরার জেলখানায় ইরাকি বন্দীদের ওপর নিষ্ঠুরতম বর্বর অত্যাচারের যে ছবি আজ কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলো কী ? বন্দীদের নগ্ন করে কুৎসিত যৌন অত্যাচার করা, তারপর খুন করা, এগুলো কোন্ সভ্যতার নিদর্শন ? এগুলো কি 'সুসভ্য' আমেরিকান-ব্রিটিশ শাসকদের 'সহৃদয় আদর' ? অন্য কেউ করলে সেটা অন্যায়, অশোভন, আর নিজেরা করলে তা দৃষ্টিনন্দন ?

ঐ চারজন আমেরিকানের মৃত্যুর বদলা নিতে মার্কিনী দখলদারদের হাজার হাজার সৈন্য ফালুজাবাসীদের উপর আদিম হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রক্তপিপাসু এই সাম্রাজ্যবাদীরা বহু নিরীহ ইরাকির রক্তে ফালুজার মাটি সিক্ত করেছিল ঠিকই, কিন্তু আক্রমণের ঠিক দু'দিন পরেই মার্কিন বীরপুঙ্গবরা লেজ গুটিয়ে একতরফা আক্রমণ বন্ধের ঘোষণা করেছিল। এর কারণ কী ? যে মার্কিন গভর্নর পল ব্রেমার ঐ চারজন মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর 'শিক্ষা' দিতে ঔদ্ধত্যের সাথে বলেছিল, এবার ইরাকিরা দেখবে ''We mean business'', সেই মার্কিন প্রশাসকই দু'দিনের মধ্যে নতজানু হয়ে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল একটিই কারণে — তা হল শ'য়ে শ'য়ে মার্কিন সৈন্যের ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছিল, ডজনে ডজনে আত্মসমর্পণ করছিল।

যে চারজন আমেরিকান খুন হয়েছিল, প্রথমে তাদের নির্মাণ শিল্পের সাথে যুক্ত কর্মী বলে প্রচার করা হয়েছিল। পরে প্রকাশ পেল, তারা মার্কিন সরকারেরই নিযুক্ত সৈন্য, তবে মার্কিন সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্য নয়। ওরা ভাড়াটে সৈন্য। বিপ্লবী আন্দোলনে এতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত গণফৌজের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বেতনভুক সৈন্যবাহিনীকেই ভাড়াটে সৈন্য বলা হত। কিন্তু এখন আক্ষরিক অর্থেই সাম্রাজ্যবাদীরা সৈন্য ভাড়া করে যুদ্ধে লাগাচ্ছে। এরা বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা নিয়োজিত সৈন্য। যেমন মার্কিনী শাসকরা বর্তমানে ইরাকে 'ব্ল্যাক ওয়াটার সিকিউরিটি কনসালটিং' নামে এরকমই এক বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে সৈন্য ভাড়া নিয়েছে। এই সংস্থাগুলো চুক্তির ভিত্তিতে সৈন্য ভাড়া দেয়। বিনিময়ে ঐ কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নেয়। এরকম বেসরকারি সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিশ্বের ছ'টি মহাদেশের দশটির বেশি দেশে আছে। কয়েকশ' কোম্পানি এই কাজে লিপ্ত, যারা সৈন্য ভাড়া দিয়ে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের (প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা) ব্যবসা করে। এই সৈন্যরা কেউই কোন দেশে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে যায় না, ইরাকেও যায়নি। এরা শুধু তাদের কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে অন্য দেশের জনসাধারণকে খুন করে, নিজেরা খুন হয়, সর্বোপরি নিয়মিত সৈন্যদের চারপাশে ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঐ সৈন্যদের রক্ষা করে অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে। এরা কাজ করে সামান্য বেতনের বিনিময়ে। কিন্তু কোম্পানিগুলো এই সৈন্য সরবরাহ করে প্রভূত মুনাফা ঘরে তোলে। মার্কিন শাসকরা তাদের দেশের এরকমই একটি কোম্পানি 'ব্ল্যাক ওয়াটার সিকিউরিটি কনসালটিং' থেকে অন্তত ২০,০০০ ভাড়াটে সৈন্য ইরাকে নিয়োগ করেছে। ব্রিটিশ শাসকরাও তাদের দেশের এরকমই কোম্পানি 'এরিনিস' থেকে ১৪ হাজার সৈন্য ভাড়া নিয়ে ইরাকে পাঠিয়েছে। প্রত্যেক সৈন্যের জন্য এই কোম্পানিগুলো প্রতিদিন ৫০০ থেকে ১৫০০ ডলার পায় যার ভগ্নাংশই এই সৈন্যদের দেওয়া হয়। বেসরকারি সামরিক কোম্পানিকে দেওয়া দৈনিক সৈন্য প্রতি এই মজুরি ব্রিটেন-আমেরিকার সরকারি সৈন্যবাহিনীর সৈন্যদের থেকে ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি। কিন্তু এই ভাড়াটে সৈন্যদের প্রতি এই কোম্পানিগুলোর না আছে কোন দায়, না আছে কোন কর্তব্য। এটাই পুঁজিবাদের নির্মম রূপ।

এই ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহের উর্বর উৎসভূমি হল দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বতন বর্ণবিদ্বেষী সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। এর সাথে আছে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বেকার যুবক, কর্মচ্যুত, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর লোক, এমনকি খোদ আমেরিকা-ব্রিটেনের বহু কর্মচ্যুত বেকার যুবক। যে চারজন নিহত আমেরিকানের কথা আগে বলা হয়েছে, এরা এরকমই নিরাপত্তা কর্মী। গত জানুয়ারি মাসে যে চারজন ব্রিটিশ সৈন্য বসরায় খুন হয়েছিল তারাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ভাড়াটে সৈন্য।

শুধু আমেরিকাই নয়, ভারতের মানুষ জানলে বিস্মিত হবেন যে, ভারত থেকেও একটি বেসরকারি সংস্থা ঠিকাদারি নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাদের ইরাকে পাঠাচ্ছে ভাড়াটে সেনা হিসাবে। এই সংস্থার বেতনভোগী ১ হাজার জন ভাড়াটে সেনা এখন ইরাকে মোতায়েন রয়েছে, যারা দখলদার মার্কিন ফৌজের হয়ে কাজ করছে। এ ঘটনা ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ জানেন, স্বভাবতই ভারত সরকারেরও অজানা নয়। ফলে, ইরাকে ভাড়াটে সেনা নিয়োগ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যে অপরাধ করছে, ভারত সরকারও তার দায় এড়াতে পারে না।

ভাড়াটে সেনারা শুধু যুদ্ধ করে বা যুদ্ধে সহায়তা করে না, যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থাকে সামাল দেয়, অত্যাচার চালায়। বহু ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতায় এরা সরকারি সৈন্যদেরও ওপরে যায়। মূলত এই ভাড়াটে সেনাদের দিয়েই আবু ঘ্রাইব বা বসরা বা গুয়ান্টানামোর জেলে বন্দীদের ওপর হিংস্র অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এদের অত্যাচার কখনো নথিভুক্ত হয় না, আড়ালে থেকে যায় যদি না দু-চারজন নিয়মিত সৈন্য বা অফিসার জড়িয়ে পড়ে। তখনই এই অত্যাচারের বীভৎস রূপ বেরিয়ে পড়ে। আবু ঘ্রাইব এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

এই বেসরকারি সামরিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো শুধু সৈন্য যোগান দেয় না, তারা অস্ত্রেরও যোগান দেয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়, সৈন্য চলাচলে ভৌগোলিক সহায়তা দেয়। আমে-রিকার পক্ষে এই বেসরকারি সামরিক শিল্প গড়ে তোলার অন্যতম আর্থিক মদতদাতা হল এমন একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চক্র, যারা ব্যাঙ্ক অব ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনালে ধস নামানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এরাই মার্কিনদের ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত ছিল।

ভাড়াটে সৈন্য ব্যবহারের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীরা আর একটা মতলব হাসিল করে নেয়। অন্য দেশের ভাড়াটে সৈন্য লড়লে যে মৃত্যু হবে, ক্ষয়ক্ষতি হবে তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ওপর বর্তাবে না। দেশের লোক ক্ষুব্ধ হবে না, বিক্ষোভ দেখাবে না, ফলে রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটবে না। এইজন্য তাদের স্লোগান — 'শবদেহের রঙ বদলে দাও'। শবগুলো হতে পারে ভারতীয়ের, পাকিস্তানির বা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা এশিয়ার অন্যান্য দেশের মানুষের, কিন্তু আমেরিকা বা ব্রিটেনের নয়। এতেই তাদের স্বস্তি। অর্থাৎ অন্যদেশের যুবক মরে মরুক, তাদের কিছু যায় আসে না, শুধু তাদের দেশের না হলেই হল।

দ্বিতীয় সুবিধা হল, নিয়মিত বাহিনীর সেনাদের ক্ষেত্রে চাকরির যেসব নিয়মাবলী ও শর্ত সরকারকে মানতে হয়, যতটুকু আর্থিক সুবিধা দিতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে যে দায় নিতে হয়, ভাড়াটে সেনাদের ক্ষেত্রে সে দায় নেই। কিছু টাকা ভাড়াটে সৈন্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলোকে দিয়ে দিলেই হবে। তাই মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামস্‌ফেল্ড এই বেসরকারি সৈন্যবাহিনীর ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী। তিনি সরাসরি বলেছেন, মার্কিন সরকার এই ব্যবস্থায় সরকারের অধীনে সৈন্য ছাঁটাই করবে এবং নিয়োগও বন্ধ করে দেবে।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অতীতে যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা ছিল সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের যুগে বিশেষ করে সভ্য সমাজের নানা নিয়ম নীতির বিকাশের সাথে সাথে তার প্রেক্ষাপটে কিছু আইন ও প্রথাও গড়ে উঠেছিল এই যুদ্ধ ও শান্তিকে কেন্দ্র করে। উদ্দেশ্য ছিল, সেনাদের মাত্রাতিরিক্ত বর্বরতা থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনী এমনকী যুদ্ধ চলাকালীনও এই নিয়মনীতি মেনে চলবে এমনটাই আশা করা হয়েছিল। কোন সরকার বা রাষ্ট্র এই নিয়মনীতি

সাতের পাতায় দেখুন

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন

চারের পাতার পর

বললেন না কেন? অবশ্য বলবেনই বা কোন মুখে, কারণ বিহার থেকে কোনমতে একটা সীট বের করা যায় কিনা, সেই চেষ্টায় তাঁরা বিহারে এই লালুপ্রসাদেরই সঙ্গ ধরেছিলেন, যদিও এবার সিপিএম-এর কপালে শিকে ছেঁড়েনি।

অনিলবাবু এবং জ্যোতিবাবু — দুজনেই অবশ্য এ প্রশ্নে বিজেপির বিরুদ্ধতা করে বলেছেন — এ প্রসঙ্গে বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার বিজেপির নেই। এই নৈতিক অধিকার সিপিএমেরও আছে কি? দুলাল, বুল্টন, মজিদ মাস্টারের মতো কুখ্যাতরা যে দলের মাথা; সুশান্ত ঘোষ, নারায়ণ বিশ্বাসের মতো মন্ত্রীরা যে দলের অলঙ্কার — তারাই বা কী করে দাগীদের মন্ত্রীসভায় নেওয়ার বিরোধিতা করে? জবাবে সিপিএম নেতারা বলতে পারেন — বিরোধিতা তো তাঁরা করেননি। তাঁরা শুধু বলেছেন — এদের মন্ত্রীসভায় না নিলেই ভালো হতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সমর্থনের উপর যেহেতু পুরোপুরি নির্ভরশীল, তাই দাগীদের মন্ত্রীসভায় নেওয়ার দায় তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনে ভোটবাজ সংসদীয় দলগুলির কারোর পক্ষেই অপরাধীদের বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়। সঙ্কটজর্জরিত যে পুঁজিবাদী সমাজ আজ মরতে বসেছে, তারই রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোটিতে আজ ঘুণ ধরে গেছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা জনগণের বিন্দুমাত্র মঙ্গল সাধন করা আজ আর কোনমতেই সম্ভব নয়। অথচ পচা-গলা আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এই শবদেহটিকে রক্ষা করতে শোষক পুঁজিমালিকরা মরিয়া। তাদেরই তল্পিবাহক হয়ে পরিষদীয় রাজনীতির ক্ষমতালোলুপ দলগুলি ভোটে জিততে ও নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে ক্রমাগত অপরাধীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নৃশংস, ভয়ঙ্কর ক্রিমিনালদের প্রোটেকশান দেবার বিনিময়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নিচ্ছে এই সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি। পুঁজিপতিশ্রেণীরও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই, বরং প্রশ্রয়ই রয়েছে। অপরাধীদের ওপর নির্ভরশীলতা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অনেক ক্ষেত্রে ক্রিমিনালরাই এই সব রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে সংসদে এমনকি মন্ত্রীসভাতেও ছায়া ফেলছে এদের অন্ধকারময় উপস্থিতি।

এই অবস্থায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যখন নির্বাচন ব্যবস্থার ওপরেই বীতশ্রদ্ধ হতে বসেছেন, তখন সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর জনগণের আস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় গত ৩০ এপ্রিল পাটনা হাইকোর্ট একটি রায়ে জেলবন্দী ও অভিযুক্তদের কাছ থেকে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এবং তাদের নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে অনুমতি না দেবার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের প্রাসঙ্গিক ধারা উল্লেখ করে জানিয়ে দিয়েছে, অভিযুক্তদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিংবা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতে না দেবার মতো কোনও আইন তাদের হাতে নেই। ফলে, যে সমস্ত মানুষ রাজনীতির অঙ্গনকে অপরাধীমুক্ত করার উপায় হিসাবে আইন ও বিচারালয়ের দিকে আশায় তাকিয়ে আছেন, তাঁদের আশা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আইন-কানুনের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাছাড়া, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজনীতিতে অপরাধীদের অনুপ্রবেশ রোখার চেষ্টা হলে অন্য একটি বিপদের সম্ভাবনাও থেকে যায়। এদেশে বিভিন্ন সময়ে 'মিসা', 'টাডা'র মতো আইন তৈরি হয়েছে, সাম্প্রতিককালে হয়েছে 'পোটা'। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আইনগুলি তৈরির সময় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, চোরাচালান, বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র রাখা ও সন্ত্রাসবাদ রুখবার জন্য, দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এগুলি করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে বিরোধীপক্ষের কণ্ঠরোধ করতে, কিংবা গণআন্দোলন দমন করতেই বেশিরভাগ সময় এই আইনকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, রাজনীতিতে অপরাধীদের অনুপ্রবেশ রুখতে শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করলে সেক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া, আইনকে কার্যকরী করবে যে পুলিশ-প্রশাসন, দুর্নীতি ও অপরাধজগতের লোকদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাজসের কথা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। সেখানে দু'একজন সৎ ব্যক্তি ব্যতিক্রম হিসাবে থাকলেও গোটা ব্যবস্থাটার চরিত্রই আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে 'প্রধান অপরাধী' কে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, প্রকৃত অপরাধী হচ্ছে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী সেইসব রাজনৈতিক দল যারা ক্রিমিনালদের কাজে লাগায়, ভোটে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করায়, মন্ত্রীসভায় স্থান দেবার ব্যবস্থা করে দেয়।

সংসদীয় রাজনীতির বর্তমান অবস্থা দেখে যাঁরা সত্যই উদ্বিগ্ন, তাঁদের বুঝতে হবে, যে পুঁজিবাদ আজ রাজনীতির মতো মহান ব্রতকে পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলির কাছে টাকা কামাবার পেশায় পরিণত করেছে, প্রতিটি কাজে ঘুষ না দিলে যে ব্যবস্থায় কাজ হয় না, যেখানে ক্ষমতালোভী দলগুলি যেকোনওভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেকোনও অনৈতিক পথ নিতে দ্বিধা করছে না, দুর্নীতির সাথে যে ব্যবস্থা সমার্থক হয়ে গেছে, যে সমাজে মূল্যবোধ প্রতিদিন মরছে, সেই পুঁজিবাদ টিকে থাকতে এই অবস্থা সমাজজীবন থেকে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব নয়। একমাত্র সংগঠিত গণআন্দোলন ও গণপ্রতিরোধের মধ্য দিয়েই একে প্রতিহত করা যেতে পারে। আর, সেই জনগণই এই ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম, যারা উন্নত রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত। একটু গভীরে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে, দক্ষিণপন্থী দলগুলি তো বটেই, এমনকী বামপন্থী নামের সংসদীয় ভোটসর্বস্ব দলগুলিকে দিয়েও একাজ হবে না। এজন্য দরকার, উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন যথার্থ বিপ্লবী গণআন্দোলনের রাজনীতি, যেটা এস ইউ সি আই নিয়ে চলছে। জনগণ যত দ্রুত এই বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হবেন ও তাকে শক্তিশালী করবেন, ক্রিমিনাল রাজনীতির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার পথও তত তাড়াতাড়ি প্রশস্ত হবে।

মুরলীমনোহর যোশির অমৃতবাণী

একের পাতার পর

রামমোহন রায়, এই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা নিয়েই ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ইংরাজ শাসকরা যখন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিল, আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে রামমোহন বলেছিলেন, সংস্কৃত ভাষা কঠিন ও আয়ত্ত করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। অথচ, এই ভাষার মধ্যে এমন কোনও সম্পদ নেই যা জানার জন্য এত পরিশ্রম ও সময় দেওয়া দরকার। আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজরা যদি ভারতীয়দের সংস্কৃত ভাষা পড়ানোই স্থির করে থাকেন, তবে সেজন্য কলেজ স্থাপন করার দরকার কী, প্রচলিত 'টোল' ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিলেই চলবে। আর, বেদ-বেদান্ত শিক্ষা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অভিমত তো চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা ব্যালেন্টাইন সাহেবের মতের বিরুদ্ধতা করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ''সাংখ্য ও বেদান্ত হল ভ্রান্ত দর্শন, এটা সাধারণভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই।'' অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক জ্যোতিবা রাও ফুলে মনে করতেন, সনাতন ভারতীয় শিক্ষা প্রাচীন ও কূপমণ্ডুক, এই শিক্ষাদান দলিতদের পুনরায় দাসে পরিণত করা ও সমাজে পুরোহিত ও সমাজপতিদের, বিশেষত পেশোয়াদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র। ভারতে আধুনিক শিক্ষার জনক এই মনীষীদের চিন্তা ও অভিমতকে যোশিজীরা কি ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন? পারেনও নি, তার চেষ্টাও করেন নি। এক্ষেত্রেও সরকারি প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরই ছিল তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁদের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক মতবাদকে পাঠক্রমে চালান করতে গিয়ে যোশিজীরা যখন প্রতিবাদের মুখে পড়লেন, অভিযোগ উঠল যে, ৫০০/১০০০ বছরের পুরনো ভাবনাধারণাকে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকদের সর্বনাশা শিক্ষা পরিকল্পনাকে বিজেপি আমদানি করছে, তখন যোশিজীরা দাবি করতে শুরু করলেন যে, সংঘ পরিবারের শিক্ষা কর্মসূচিই নাকি আধুনিক — যদিও এই আধুনিকতার সংজ্ঞা একমাত্র যোশিজীদের অভিধানেই পাওয়া যাবে।

যোশিজী দাবি করেছেন, তাঁর আমলে শিক্ষাব্যবস্থাকে 'মানবিক' করতে 'মানবিক মূল্যবোধ', 'দেশের প্রতি কর্তব্য', বা 'পরিবেশ সম্পর্কে ভাবনা', 'সর্বধর্ম সমন্বয়' ইত্যাদি নাকি শুরু হয়েছিল। যোশিজী 'পণ্ডিত' ব্যক্তি হয়েও কথাটা ঠিক বলেন নি। এর সূত্রপাত হয়েছে কয়েক দশক আগে আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের দ্বারা পরিচালিত হাজার হাজার সরস্বতী শিশুমন্দির ও বাল শিশুমন্দিরের মাধ্যমে। এমন মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা তাঁরা দিয়েছেন যে, ঐ শিশুরা শুধু ভিন্ন ধর্মের কারণে অন্য ধর্মাবলম্বী শিশুদের ঘৃণা করতে শিখছে, বড় হয়ে দাঙ্গা বাধাতে, এমনকী নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে তাদের হাত কাঁপছেনা। তাঁদের দেওয়া মূল্যবোধে দীক্ষিত যুবকদের চেহারা বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও বিজেপি যুববাহিনীর দেশজোড়া উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। গুজরাট দাঙ্গায় খোলা তরোয়াল হাতে মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধা হিংস্র যে যুবকের ছবি সারা দেশ দেখেছিল — সেটাই তো বিজেপি'র মূল্যবোধের প্রতীক! কী সেই মূল্যবোধ যা মায়ের পেট কেটে গর্ভস্থ শিশু সন্তানকে বার করে এনে হত্যা করতে শেখায়? কোন্ সেই শিক্ষা যা নরেন্দ্র মোদীর মতো জল্লাদ তৈরি করে? এর জবাব কেবল যোশিরাই দিতে পারেন। ডঃ যোশি 'সর্বধর্ম সমন্বয়ের' শিক্ষার কথা বলেছেন। স্বয়ং তিনি এবং আদবানী, উমা ভারতী, ঋতম্ভরা, বিনয় কাটিয়ার প্রমুখ সেনাপতিদের উপস্থিতিতে ও নির্দেশে '৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যে হাজার হাজার করসেবক (পড়ুন, বজরং বাহিনী) প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করল, যারা গুজরাটে ভারত গৌরব সঙ্গীতজ্ঞ ফৈয়াজ খাঁর সমাধি মাটিতে মিশিয়ে দিল, সপুত্র গ্রাহাম স্টেইনকে পুড়িয়ে মারল তারা তো বিজেপির ''সর্বধর্ম সমন্বয়ে''র শিক্ষায় দীক্ষিত সৈনিকই ছিল, তাই নয় কি যোশিজী?

পরিবেশ ভাবনার কথাও তিনি বলেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত নদনদীগুলো খাল কেটে মিলিয়ে দেওয়ার উদ্ভট ও সর্বনাশা পরিকল্পনা বিজেপি সরকারেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। দেশের অধিকাংশ পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীরা একবাক্যে বলেছেন, এর দ্বারা কেবল কয়েক হাজার কোটি টাকার অপচয়ই করা হবেনা (দলীয় ঠিকাদারদের পকেটপূরণকে বিজেপি অপচয় বলবেই বা কেন), অধিকাংশ নদী শুকিয়ে গিয়ে দেশে খরা ও বন্যার প্রকোপ বাড়বে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। এমন পরিবেশ ভাবনাই যদি ছাত্ররা শিক্ষার মধ্য দিয়ে লাভ করে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ যে যথার্থই অন্ধকার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এন সি ই আর টি'র রচনা করা ইতিহাস বইতে কিছু 'সঠিক তথ্য' ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, যাতে ছাত্ররা 'ভারতের সঠিক ইতিহাস' জানতে পারে। এইসব 'সঠিক তথ্যে'র যেসব নমুনা ইতিমধ্যেই জনসাধারণ জেনেছেন, তা চমকে দেওয়ার মতো। যেমন, এস সি মিত্তালের লেখা দ্বাদশ শ্রেণীর বইয়ে বলা হয়েছে, 'রাসবিহারী বসু ছিলেন সুভাষ বসু'র বড় ভাই। কী নিদারুণ 'সঠিক তথ্য'! আবার একথা সুবিদিত ঐতিহাসিক সত্য যে, হিন্দু মহাসভার প্রখ্যাত নেতা বীর সাভারকার প্রথম জীবনের কয়েক বছর বাদে বাকি সম্পূর্ণ জীবন ব্রিটিশবিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কট্টর বিরোধী ছিলেন। সেই সাভারকারকে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সেনানী হিসাবে দেখাতে হলে ইতিহাস পাল্টাতে হয়, সেজন্য নতুন বইয়ে লেখা হল, ''সাভারকারই সুভাষ বসুকে দেশ ছাড়তে পরামর্শ দিয়েছিলেন।'' অর্থাৎ দেখানো হল, মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা সুভাষ বসুর সাথে যেন সাভারকারের ঘনিষ্ঠতা ছিল, যা বাস্তবে ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। এমন অসংখ্য মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যে ঐ ইতিহাস বই ভর্তি। অথচ, হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে ১৯৪০ সালেই সুভাষ বসু ঝাড়গ্রামের এক সভায় বলেছিলেন, 'সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছে। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলেই হিন্দুমাত্রই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, হিন্দুমাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। ··· এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন। তাদের কথা কেউ শুনবেন না।''

একইভাবে এন সি ই আর টি রচিত ইতিহাস বইতে বৈদিক যুগ, আর্য সভ্যতা, মুঘল শাসনপর্ব, ভারতের সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম অবদান ইত্যাদি ইতিহাসের বিষয়গুলিকে যথেচ্ছভাবে বিকৃত করা হয়েছে, যাতে তা সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী চিন্তার অনুকূল হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইতিহাস অনুসন্ধান নয়, প্রমাণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে নিজেদের মনমাফিক বিকৃত করাকেই যোশিজীরা সঠিক তথ্য বলে চালাতে চেয়েছেন। যোশিজীরা যতই চেষ্টা করুন, তাঁদের দ্বারা ইতিহাসের এই বিকৃতির ইতিহাসকে তাঁরা মুছে দিতে পারবেন না।

সিপিএম-কংগ্রেস মৈত্রী হঠাৎ করে হয়নি

২২ মে 'আজকাল' পত্রিকায় 'কী চাইছেন ওঁরা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সিপিএম-কংগ্রেস মৈত্রীকে যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে এবং সাথে সাথে এই মৈত্রীর সমালোচক এস ইউ সি আইকে 'জাতীয় বাস্তবতা' সম্পর্কে অজ্ঞ, 'জনগণের সাথে সংযোগহীন' একটি রাজনৈতিক দল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের এই ধরনের মন্তব্য ও যুক্তি (!) প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

একথা আজ সুবিদিত, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দিয়ে রাজ্যবাসীর যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার তুলনা মিলবে না। এটাও অজানা নেই যে, একমাত্র এস ইউ সি আই দল রাজ্যবাসীকে সংগঠিত করে টানা ১৯ বছর আন্দোলন চালিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যাতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালু করা ছাড়া ওদের কোন উপায় ছিল না। রাজ্যের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এ এক উজ্জ্বল ঘটনা। অন্দোলনের এই বিজয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। তাই দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাজনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যখন একযোগে নতুন নতুন আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তখন এস ইউ সি আই-এর ডাকেই হাজার হাজারে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। এটাই বাস্তব। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সংগ্রামী মানুষ আজ এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের মধ্যে প্রাণের রসদ সংগ্রহ করছেন। জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী এই ধরনের একটি দলকে 'জনগণের সাথে সংযোগহীন' হিসাবে বর্ণনা করে সম্পাদকমশাই নিজের বাস্তববোধের প্রতি সুবিচার করেননি — এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এখন, সিপিএমের কংগ্রেস সমর্থন প্রসঙ্গে মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য বিচার করে দেখা যাক। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে — 'হঠাৎ কিছু করল না সিপিএম'। আমরাও জানি, সিপিএম এটা হঠাৎ করে করেনি। বুর্জোয়া দলগুলোর মধ্যে প্রগতিশীল শক্তির সন্ধান ওদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, স্বাধীনতার পর থেকেই তার শুরু। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নেহেরু-প্যাটেল দ্বন্দ্বে ওদের স্লোগান ছিল — ''You Nehru don't resign, we the communists are behind you''। অর্থাৎ, ''নেহেরু তুমি পদত্যাগ করো না, আমরা কমিউনিস্টরা তোমার পেছনে আছি''। মানে প্যাটেল প্রতিক্রিয়াশীল, নেহেরু প্রগতিশীল। একইভাবে ১৯৬৯ সালে সিণ্ডিকেট-ইণ্ডিকেট বিরোধে সিপিএমের বক্তব্য ছিল, ইন্দিরা গান্ধী প্রগতিশীল, সিণ্ডিকেটপন্থীরা প্রতিক্রিয়াশীল। তাই ইন্দিরা গান্ধীর মাইনরিটি গভর্নমেন্টের (সংখ্যালঘু সরকারের) মদতদাতা ছিল সিপিএম। সিপিএম তখন বলেছিল — ''The Indira Gandhi wing also contain within its fold a healthy trend which hates big landlords and monopolists'' (পিপলস্ ডেমোক্রেসী, 15-2-70)। অর্থাৎ ''ইন্দিরা গান্ধী অংশের মধ্যে একটি সুস্থ ধারাও বর্তমান, যা বৃহৎ ভূস্বামী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঘৃণা করে''। আবার, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সেই প্রগতিশীল ইন্দিরা গান্ধীই হলেন চরম স্বৈরাচারী; বন্ধু হলেন সিণ্ডিকেট (সংগঠন কংগ্রেস) নেতা মোরারজি, জনসংঘের অটল-আদবানি। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব অটুট। ভি পি সিং সরকারের দুই পা — বিজেপি ও সিপিএম। সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসকে হঠাতে ভি পি সিং-জ্যোতি বসু-বাজপেয়ীজীর যৌথ উদ্যোগের কথা আজও আমরা ভুলিনি। আজকে বাজপেয়ী-আদবানি চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং সোনিয়াপন্থী কংগ্রেস 'ধর্মনিরপেক্ষ' প্রগতিশীল। তাই আজ সিপিএম-কংগ্রেস মৈত্রী হঠাৎ করে হয়নি — এটা ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনে সুবিধামত বুর্জোয়াদলগুলোকে 'প্রগতিশীল' তকমা পরাতে কুযুক্তি আমদানিতে ওরা রীতিমত দক্ষ। সিপিএমের এই রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার ফলেই দেশের বুকে বামপন্থা একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা হিসাবে — বাস্তব জমি এবং বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আত্মপ্রকাশ করতে পারলনা।

বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করেছে ও করছে এবং তাকে সমস্ত দিক দিয়েই পরাজিত করা দরকার — এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, যে যুক্তিতে বিজেপি বিরোধিতা, সেই একই যুক্তিতে কংগ্রেস বর্জনীয় নয় কেন? বিজেপি'র গোধরা, কংগ্রেসের দিল্লিতে শিখ নিধন; বিজেপি'র বাবরি ধ্বংস, কংগ্রেসের রামমন্দিরের তালা খোলা; বিজেপি'র গোমাতা সংরক্ষণ, মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার গোহত্যা নিবারণী বিল; অসংখ্য দাঙ্গার আয়োজক বিজেপি, দিল্লির শিখ নিধন সহ বহু দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেস; বিজেপি'র গরম হিন্দুত্ব, কংগ্রেসের নরম হিন্দুত্ব — তাহলে? আসলে সিপিএম নেতারা ভুলে গিয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতারও শ্রেণীভিত্তি আছে। জনগণের মধ্যে বিভেদকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা পুঁজিপতিশ্রেণীরই প্রয়োজন। তাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা না করে সাম্প্রদায়িকতার কেশাগ্র স্পর্শ করা যাবে না। যারা মনে করছেন, বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করা গেল — তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ, ধর্ম, জাতপাত, সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি — সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদের বেঁচে থাকার একটা অন্যতম শর্ত।

আজকের জাতীয় বাস্তবতা কী? ভারতের পুঁজিবাদ তীব্র সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়ে সঙ্কটের সমস্ত বোঝা জনগণের ঘাড়ে চালান করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রে নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার, সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার পুঁজিবাদের এই চাহিদাই পূরণ করেছে এবং সন্দেহ নেই সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস জোট সরকারকেও এই একই কুকর্ম করতে হবে। আর ধারাবাহিকভাবে কুকর্ম করার জন্য পুঁজিবাদের চাই এমন রাজনৈতিক কাঠামো যাতে এই কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে জনগণের ক্ষোভকে খানিকটা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে প্রশমিত করা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে পুঁজিবাদ শিখেছে, দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই এই কাজে সর্বোত্তম। আমেরিকায় ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান, ইংল্যান্ডে টোরি-লেবার পার্টি — এইভাবে প্যাল্টাপাল্টি করে সরকারে বসে সেখানকার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সেবা করে যাচ্ছে। একইভাবে ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীও এদেশে এই দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়িত করার চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে রূপ দেবার চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে কংগ্রেস ও বিজেপি মূলত এই দুই দলকে কেন্দ্র করে এ ব্যাপারে বহুদূর পর্যন্ত সফল হয়েছে। সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের নেতৃত্বে জোট সরকার গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করার দ্বারা পুঁজিপতিশ্রেণীর সেই চক্রান্তকেই সফল করতে সিপিএম সাহায্য করেছে এবং এইভাবে এই চক্রান্তেরই অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

সত্যিকারের বামপন্থী ভূমিকা পালন করতে চাইলে প্রকৃত বাম-গণতান্ত্রিক জোট গঠন করে

আটের পাতায় দেখুন

যুদ্ধও একটা ব্যবসায়িক পণ্য

পাঁচের পাতার পর

লংঘন করলে আন্তর্জাতিকভাবে তাদের জবাবদিহি করতে হত। ঠিক একইভাবে নিজের দেশের পার্লামেন্টে বা জনপ্রতিনিধিদের কাছেও সরকার ও সেনাবাহিনীকে কৈফিয়ৎ দিতে হত কোন নিয়মবহির্ভূত আচরণ করার জন্য। এভাবেই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন রাষ্ট্র যখন বেসরকারি সৈন্যবাহিনীর হাতে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধবন্দীদের 'শিক্ষা'র দায়িত্ব তুলে দেয়, সেই বেসরকারি ভাড়াটে সৈন্যদের এই নিয়মনীতি মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে কি? তাদের কোন আন্তর্জাতিক বা জাতীয় দায়বদ্ধতা থাকে কি? অন্য কথায় সরকারি কোন নিয়মনীতির নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর থাকে না। আজ একে বিদেশে যুদ্ধ করার জন্য বা কোন বিদ্রোহ দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবহার করছে, আগামীকাল পুঁজিপতিশ্রেণী একে দেশের গণআন্দোলন দমন করার কাজে ব্যবহার করতে পারে, যার দায় সরকারের ওপর বর্তাবে না। সরকার এর দায়িত্ব নাও নিতে পারে। এ এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা। হিটলারও তার নাৎসী আক্রমণের সময় নিয়মিত সেনার বদলে এই 'ভাড়াটে সেনা'র চিন্তা মাথায় আনতে পারেনি যা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন ফ্যাসিস্ট শাসকরা আমদানি করছে।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে যে ভয়ঙ্কর সত্যটা বেরিয়ে আসে তা হল, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীও আজ বহুজাতিক শিল্পপতিদের হাতের পণ্য। এরই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 'হিলিবার্টন' নামে এক কোম্পানি। এরা ইরাকে তেল তোলার বরাত পেয়েছে। সেনাবাহিনীকে খাদ্য জোগানোর ঠিকাদারি এদের হাতে। আবার হিলিবার্টনের শাখা 'ব্রাউন অ্যাণ্ড রুট' একটি বেসরকারি বহুজাতিক সামরিক কোম্পানি, যারা ইরাকে সৈন্য সরবরাহ করেছে, বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী যোগান দিয়েছে। এই হিলিবার্টন কোম্পানির মালিক কে? তিনি আর কেউ নন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি মিঃ ডিক চেনি। এই ডিক চেনিই তার কোম্পানির স্বার্থে আমেরিকার প্রশাসনকে, হোয়াইট হাউসকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল ইরাক আক্রমণের জন্যে। পরবর্তীকালে যুদ্ধে ইরাককে ধ্বংস করে তার পুনর্গঠনের নামে এই চেনির হিলিবার্টনকে হাজার হাজার কোটি ডলার নির্মাণ চুক্তির বরাত দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কোম্পানিগুলোই বিশ্বায়নের অনুষঙ্গ 'আউটসোর্সিং'-এর (বাইরে থেকে কাজ করিয়ে নেওয়া) সাহায্যে দেশ বিদেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে লোভ দেখিয়ে যুব সম্প্রদায়কে, দক্ষ বেকার কারিগরদের বা অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের বেসরকারি সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেছে। দেশে দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে মানুষ রপ্তানি করছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য। এরা মৃত্যু ব্যবসায়ী। এরা সভ্যতার চরম শত্রু।

ঢাকায় বিক্ষোভ

একের পাতার পর

বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাইফুর রহমান তপন।

সমাবেশের আগে একটি মিছিল তোপখানা রোডের দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে পল্টন মোড়ে গেলে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়। সমাবেশ শেষেও পুলিশ মারমুখী অবস্থান নিয়ে মিছিল করতে বাধা দেয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ ইরাকের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক। ফলে লাখো ইরাকির হত্যাকারী রামসফেল্ডকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের গণবিরোধী অবস্থান প্রমাণ করল তারা বুশ প্রশাসনের দোসর। ৫ জুন হরতাল চলাকালে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন ও বাসদের মিছিলে বাধাদানের বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা জানান এবং সরকারের এ ঘৃণ্য অবস্থানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকায় মিছিলের পুরোভাগে বাসদ নেতৃবৃন্দ

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

গণদাবী ১১ জুন, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ৪২ সংখ্যা ৮

‘মার্কিন-ইজরায়েল চক্র ইরাক-প্যালেস্টাইনে গণহত্যা বন্ধ কর’

৫ জুন বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

৫ জুনের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। (উপরে) আমেরিকায় ANSWER সংগঠনের আহ্বানে বিক্ষোভ। (নিচে) কলকাতায় অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের বিক্ষোভে বুশ ও শ্যারনের কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন কমরেড মানিক মুখার্জী।

কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ

‘‘ইরাকে ভিয়েতনামের মতো কোন কমিউনিস্ট পার্টি নেই, হো চি মিনের মতো নেতা নেই ; তা সত্ত্বেও ইরাকি বীর জনগণের লড়াই দেখিয়ে দিচ্ছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দেশপ্রেমের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়, জনগণের সেই শক্তিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কোন দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তিরও নেই।’’ ৫ জুন মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে একথা বলেন অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহ-সভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী।

এদিন আমেরিকাস্থিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন ‘ANSWER’ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করে ওয়াশিংটন সহ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে মার্কিন-ইজরায়েল বিরোধী লাখো লাখো মানুষের বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। এই কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানাতে অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম ভারতের রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

কলকাতায় এদিন দুপুরের খররৌদ্রে এক বিক্ষোভ মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে পৌঁছায় এবং সেখানে ইজরায়েলি প্রেসিডেন্ট অ্যারিয়েল শ্যারন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন কমরেড মানিক মুখার্জী। স্লোগান ওঠে, ‘প্যালেস্টাইনে গণহত্যা বন্ধ কর’, ‘ইরাকের ওপর সামরিক আক্রমণ বন্ধ কর’, ‘ইরাকি মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই লাল সেলাম’, ‘সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক’। এই বিক্ষোভ ভারত সরকারের মার্কিন ঘেঁষা প্রবণতা এবং ভারতের জঙ্গলে মার্কিন সেনাদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার তীব্র নিন্দা করে।

সিপিএম-কংগ্রেস মৈত্রী

সাতের পাতার পর

পুঁজিবাদের এই নীল নকশাকে উন্মোচিত করা ও গণসংগ্রামের রাজনীতির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা দরকার ছিল। আমাদের দল সিপিএম নেতৃত্বের কাছে সেই আবেদনই বারবার করেছিল। সিপিএম নেতৃত্ব তাতে সাড়া দেননি। সেটাই ছিল জনগণের অর্থে সত্যিকারের বিকল্প এবং সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করার প্রকৃত রাস্তা। সম্ভবত সিপিএমের অসুবিধা হবে বলে আজকাল সম্পাদক সে বিষয়টির উল্লেখ করেননি। বাস্তব সত্য, যা আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে তা হচ্ছে, এই রাজনীতি আজ আর সিপিএমের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কারণ পুঁজিবাদের সেবা করে ক্ষমতার ভাগীদার হওয়াই এখন ওদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে — কংগ্রেস ক্ষমতায় এল, কিন্তু বিজেপি পরাজিত হয়নি। দ্বিদলীয় রাজনীতির শর্ত মেনে বিজেপিকে বিশ্রাম দেওয়া হল। কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারালে আবার বিজেপিকে ক্ষমতায় আনা হবে এবং তারপর আবার কংগ্রেসকে। এই খেলাই চলবে। আমরা এই খেলার শরিক হব, নাকি সংগ্রামের আঘাতে বুর্জোয়া রাজ ধ্বংসের উদ্যোগ নেব তার বিচার জনগণকেই করতে হবে।

মার্কিন সরকারি কর্তার মুখে সিপিএমের প্রশংসা

‘‘উন্নয়ন বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রয়াস চালাচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগকে যেভাবে স্বাগত জানাচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী শ্রম আইন তৈরি করার জন্য, লোকসানে চলা (পশ্চিমবঙ্গের) রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এই সরকারের যে আগ্রহ, তা দেখে আমি আশাবাদী যে আর্থিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নেবে।’’

‘‘ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান চালিয়ে আমেরিকার এক বৃহৎ কোম্পানি বলেছে, ব্যবসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই এখন ভারতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় রাজ্য।’’

উপরের প্রশংসাপত্র বেরিয়েছে সরাসরি এক মার্কিন কূটনীতিকের মুখ থেকে। দিল্লিস্থ মার্কিন দূতাবাসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা লী ক্রডউইগ গত ৩ জুন কলকাতায় ভারত চেম্বার্স অফ্ কমার্সের এক সভায় এসে একথা বলেছেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে ইতিপূর্বে আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের পুঁজিমালিকদের প্রভাবশালী সংগঠন আই টি অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা’র পূর্ণ সমর্থন পাওয়ার পর এবার বামফ্রন্ট সার্টিফিকেট পেল সরাসরি মার্কিন প্রশাসনের কর্তার কাছ থেকে।

স্মরণীয় যে, গত ১৯ মে ওয়াশিংটনে মার্কিন শিল্পপতিদের এক সম্মেলনে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিরোমণি রিলায়েন্সের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি বলে এসেছেন যে, সিপিএমকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উপরন্তু আম্বানি এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, আজ যারা কেন্দ্রের সরকারের প্রতি সিপিএমের সমর্থন দেখে সমালোচনা করছে, পরে সিপিএমের ইতিবাচক ভূমিকা দেখে তারা লজ্জা পাবে। সিপিএম সম্পর্কে কত গভীর আস্থা থাকলে একজন পুঁজিপতি এই ভাষায় কথা বলতে পারেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয়না।

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তল্পিবাহক সরকার বা প্রশাসন বারবার পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ টেনে অন্যান্যদের এটাই বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ভূমিকা দেখো, তাহলেই বুঝবে ওদের ‘কমিউনিস্ট’ নামটায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই; কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সিপিএমের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলে দেশি বিদেশি শিল্পপতিদের একথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, নতুন সরকার নয়া উদার আর্থিক নীতির পথ ত্যাগ করে অন্য কোনও পথ ধরে পুঁজিপতিদের মুনাফা লুঠে বাধা দেবে। বরং লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সিপিএম পাশে থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে জনকল্যাণের বুলি আউড়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখা আরও সহজ হবে। সিপিএমের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে যাদের শ্রেণীসচেতনতা আজও অবশিষ্ট আছে, তাঁরা ভেবে দেখুন — দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, সেই সরকারের শ্রেণীচরিত্রটি কী?

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net